OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 345 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 345 - 350
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অরণ্য-বহ্নি’ : আদিবাসী জনজাতির আখ্যান

ড. আনিসুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: anisurrahaman1988@gmail.com
0009-0008-3758-4253

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Pre-independence and Post-independence Periods, Bloodthirsty eyes, Exploitation, Oppression, Voice of History, Social Degradation, Accumulated discrimination, Alternative historical Narrative, Indigenous People.

Abstract
The writings of Tarashankar Bandyopadhyay reveal the history of the struggle of the people of Birbhum district which is inhabited by tribals, both in the pre-independence and post-independence periods. The bloodthirsty eyes of the English merchants, exploitation[3] and oppression, the deception and fraud of the local landlords and moneylenders, and the ruthless exploitation made the life of the tribals unbearable. The narratives of all these tribal people living in their own land are also found in Tarashankar's novels. 'Aranya-Banhi' (1966) is a popular novel of that genre, which is written in the context of the Santal rebellion of 1854-1855. Here, the author has constructed the history of the past glory of the Santal people by combining historical facts and truths and a folk-friendly historical concept. Tarashankar Bandyopadhyay has chosen the voice of history as a protest against the social degradation, political oppression, violence or the accumulated discrimination at all levels of the sixties after independence. Therefore, Tarashankar Bandyopadhyay's 'Aranya-Bahni' is an exceptional alternative historical narrative of the helpless suffering and pain of the indigenous people.

Discussion

রক্তময় রাঢ়-বঙ্গের কঙ্কর মৃত্তিকার কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের আখ্যানে স্থান পেয়েছে নিম্নবর্গীয় আদিবাসী জনসমাজের জীবনবেদ। প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তরকালের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সমাজ পরিবর্তনকে কথাসাহিত্যের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন লেখক। তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে সমকালীন সমাজের বিকৃত রূপ, মানুষের প্রবৃত্তি ও সমাজদেহের গভীরতম ক্ষত। আদিবাসী জনজাতির কৌম জীবনব্যবস্থা, সামাজিক সংকট, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আখ্যান তারাশঙ্করের লেখার মূল উপজীব্য। বস্তুত আদিবাসী জনজাতির অবস্থান এবং উচ্চবর্গের সাংস্কৃতিক আধিপত্যে ক্ষয়িষ্ণু জীবনযাত্রা তারাশঙ্করের লেখার পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত। এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর অনুরাগীর মন্তব্য, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 345 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে তাঁর সমসাময়িক প্রায় সত্তর বছরের দেশ-কালের ইতিবৃত্ত জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর এই ভারতবর্ষের ও বাঙলাদেশের নানা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে পটভূমিকা ও নাটকীয়তা জুগিয়েছে।"[১]

ইংরেজ বণিকের রক্তচক্ষু, শোষণ-পীড়ন, দেশীয় জমিদার ও মহাজনের প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, নির্মম শোষণপ্রক্রিয়া আদিবাসী জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছিল। নিজভূমে পরবাসী এই সমস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা পাওয়া গিয়েছে তারাশঙ্করের উপন্যাসে। 'অরণ্য-রহ্নি' (১৯৬৬) সেই ধারারই একটি জনপ্রিয় আখ্যান, যা ১৮৫৪-১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে রচিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যে সাঁওতাল বিদ্রোহের অনুষঙ্গের অবতারণা করেছিলেন 'কালিন্দী'-তে, তাকেই প্রায় আড়াই দশক পরে লেখা 'অরণ্য-বহ্নি' (১৯৬৬)-তে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে এই ধারাকে আরও শক্তপোক্ত করে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহাশ্বেতা দেবী, অভিজিৎ সেন প্রমুখ। এ ধারার অন্যতম আখ্যানের অন্যতম অভিজ্ঞান মহাশ্বেতা দেবীর 'সিধু-কানুর ডাকে' (১৯৮১), 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২), অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫) ইত্যাদি।

সময়কাল ১৮৪৫-১৮৫৫, তখন ইংরেজের ভারতবর্ষ জয় একরকম পূর্ণতা পেয়েছে। লর্ড ডালহৌসি ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে সে কাজ সমাধা করেও ফেলেছেন। সেই সময় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা একটি প্রদেশের অন্তর্গত এবং ভাগলপুর একটি ডিভিশন, বীরভূমের উত্তর পর্যন্ত সীমানায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য আদিবাসী সাঁওতাল গ্রাম। এরা কারও অন্নে ভাগ বসায়নি। নিজেদের অন্ন নিজেরা উৎপাদন করেছে এবং বাড়তি উৎপাদন করে দিকুদের জুগিয়েছে। ঠিক এই সময়ই ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি পড়ে তাদের উপর। নিষ্ফলা বনভূমি থেকে রাজস্ব সংগ্রহ এবং সাঁওতালদের বসতি স্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য মি জেমস পোটেন্ট নামক প্রবীণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করেন। যারা একবেলা একমুঠো অন্ন, বনজ ফল-কন্দ ও শিকার করা পশুপাখির মাংসে বেঁচে ছিল সেই সাঁওতালেরা নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসের স্বপ্ন দেখে এবং কৃষিকাজে মন দেয়। কিন্তু সময়ের অভিঘাতে তারা দেখতে পাই, -

> "প্রথম পুরুষ যে জমি তৈরি করেছিল দ্বিতীয় পুরুষে তার অধিকাংশই কেনারামদের লক্ষ্মীর খাতার হিসেব কুমির হয়ে গিলেছে; অন্যদিকে তাদের প্রায় অর্ধেক লোক দশ টাকা ধার করে তাদের একরকম ক্রীতদাস হয়ে গেছে।"[২]

উপন্যাসের আখ্যানে জানা যায়, কোনো সাঁওতাল যদি কোনো জমিদারের কাছে দশ টাকা ধার নিত তাহলে সেই সাঁওতাল সারাজীবনের মতো তার কাছে বিকিয়ে যেত। কেননা টাকায় মাসে ছ-আনা সুদ, মাসান্তে দশ টাকায় তিন টাকা বারো আনা সুদ। সে সুদ আসলে ভুক্তান হয়ে তেরো টাকা বারো আনা। পরের মাসে তা কুড়ি টাকায় পৌঁছাত। আবার তার পরের মাসে সেই কুড়ি টাকা হত সাতাশ টাকা চার আনা। এই চক্রবৃদ্ধি ঋণ শোধ দিতে সাঁওতালরা মহাজনের বাড়িতে জনমজুর খাটত। তার বিনিময়ে মজুরি নয়, জুটত পেটভাতা। তার মানে দাঁড়ায় যে, আজীবন জনমজুর খেটেও টাকা শোধ হত না, এমনকি মরলেও না। ফলে বংশপরম্পরায় তাদের ছেলেপুলেদের এই ঋণ শোধ দিতে হত, -

> "আমড়াপাড়ায় কেনারাম ভকতের বাড়ি। সেখানে সেদিন মহেশ দারোগা এসে গর্ভু সাঁওতালকে বেঁধেছিল পিছমোড়া করে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যে একটা খুনের চার্জ। গর্ভু কেনারামের দাসত্ব স্বীকার দল করতে চায় না। সে বলে-সারা জীবন খেটেছি। তাতেও যদি দশ টাকা দেনা শোধ না হয়ে থাকে তো হল না। ও দেনা নাই। আমি খাটব না।"[৩]

হাড়মা মুর্মু, ভীম মাঝি, নিমু মাঝি, লক্ষ্মণ মাঝি হাজারে হাজারে এমন সাঁওতাল তাদের কবলে পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছে। পোটেন্ট সাহেব এইসব যে জানতেন না তা নয়, ভালোই জানতেন। তিনি দিকুদের অত্যাচারের কথা জানেন। আবার রেলের রাস্তাবন্দিতে কন্ট্রাকটরের ইংরেজ এবং ফিরিঙ্গি কর্মচারীদের সাঁওতাল রমণী নিয়ে বিলাসের কথাও জানেন। কমিশনার মি সাদারল্যান্ডকে সে কথা তিনি বলেওছিলেন। কিন্তু মি সাদারল্যান্ড অন্য ধরনের মানুষ। তাই তিনি বলেছিলেন,-

> "ওরা মরবার জন্যেই জন্মেছে এবং অন্যের জন্য খেটে মরবে। আমি হিন্দুদের অত্যন্ত ঘৃণা করি কিন্তু তবু উই ওয়ান্ট দেম টু সার্ভ আওয়ার পার্পাস। যদি ইংরেজদের এনে এই দেশটা ভরিয়ে দেওয়া পসিবল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 345 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> হত তবে ওদের দাম আমার কাছে থাকত না। ক্রীশ্চান করছে সে তো ভালো করছে। ভবিষ্যৎকালে ক্রীশ্চান হিসাবে আমাদের অনুগত হলে ওদের দিয়ে হিন্দুদের জব্দ করব। আর ওদের মেয়েদের নিয়ে ব্যাচিলর ইংলিশ অ্যান্ড অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা এনজয় করে-করতে দাও।”[৪]

এহেন পরিস্থিতিতে দিকুদের অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কোনো সাঁওতাল যদি এই অনাচার-অবিচারের প্রতিবাদ করত তাহলে তার ভাগ্যে জুটত হয় মৃত্যু না হয় জেল। ভীম মাঝি একবার কেনারামের কাছে চাষের জন্য বারো শলি ধান ধার নিয়েছিল। ধান ওঠার সময় সুদে-আসলে সেই বারো শলি ধান হয়ে যায় একশো শলি। ভীম মাঝি তা শোধও করেছিল। কিন্তু কেনারাম আবার দাবি করে বসে একশো শলি ধান। ভীম মাঝি তা দিতে অস্বীকার করায় কেনারাম তাকে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হিন্দু মহাজন-জোতদারদের, সাহেবলোকের অত্যাচার-অনাচার, শোষণ-নিপীড়নের এমন দৃষ্টান্ত আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যানের কথনবিশ্বে ভুরি ভুরি রয়েছে।

বাগনাডিহির চুমার মাঝির দুই সন্তান সিধু মুর্মু আর কানু মুর্মু। সিধু যেমন গোঁয়ার তেমনই বোধবুদ্ধি এবং হিসেবনিকেশেও পারঙ্গম। তাকে সহজে ঠকানো যায় না। বয়স ২৮-৩০ বছরের মধ্যে। কারও অন্যায় বা ক্ষতি সে যেমন করে না তেমনই অন্যায় দেখলে সে চুপচাপও থাকতে পারে না। সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে লিটাপাড়ার বারহেটের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে গিয়েছিল। অবশ্য তারা টাকা-পয়সার বিনিময়ে কোনো দ্রব্য কেনে না। ঘি, ময়ূরের পালক, চিতাবাঘের নখের বিনিময়ে তারা তাদের সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজার থেকে কিনে আনে। বারহেটের বাজারের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী মহেন্দর ভকত, কেনারাম ভকতের জ্ঞাতি ভাই। সে প্রায়শই সাঁওতালদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে বিশেষত ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তাদের ঠকিয়ে মুনাফা লোটে। সিধু যায় তার দোকানে বাজার করতে। সে শুনেছিল ঘিয়ের সের ছ-আনা, নুনের সের ছ-পয়সা। কিন্তু মহেন্দর ভকত সিধুকে জানায় ঘিয়ের দাম চার আনা, নুনের সের দু-আনা। এই কথা শুনে সিধু তার ঘি মহেন্দর ভকতের কাছ থেকে ফেরত চায়। কিন্তু পায় না। উলটে মহেন্দর ভকত নিজের প্রতাপ জাহির করে বলে, -

> “ন্যায্য দাম যা হল নিয়ে চলে যা। মাপ করে ঘি নিয়েছি, ফিরে দিব ই কোন্ কথা? আঁ? কোন্ আইনে তু ফিরে পাবি? বেশি চালাকি করলে থানাতে মহেশ দারোগার কাছে বেঁধে পাঠিয়ে দিব। হাজার সাঁওতাল আসছে, ঘি কিনছি, ধান চাল কিনছি, চালান দিব শহর মুলুকে।”[৫]

শুধু তাই নয়, সিধু এখানে গিয়েই তাদের ওপর হওয়া অন্যায়-অবিচারের প্রকৃত চিত্র দেখতে পায়। সাহেবগঞ্জের নিমু হাঁসদা তার সঙ্গে হওয়া অন্যায়-অবিচারের কথা সিধুকে জানায়। সে সিধুকে বলে তার পিতা দশ টাকা ধার নিয়েছিল মহেন্দর ভকতের কাছে। সেই টাকা এখনও শোধ হয়নি। সে সাত বছর ধরে মহেন্দর ভকতের বাড়িতে কাজ করেও সেই দেনা শোধ করতে পারেনি। সে আরও জানায় তার মতো চাকর মহেন্দর ভকতের বাড়িতে চল্লিশ-পঞ্চাশজন আছে। তারা কেউ মহেন্দর ভকতের দোকানে কাজ করে, কেউ বাড়িতে, কেউ বা খেতে। বারহেটের বাজারে এমন চাকরের সংখ্যা দেড়শো-দুশো। এইভাবেই, -

> “ভেঙে পড়ল তাদের গ্রাম ও সমাজব্যবস্থা। জমির দখল তাদের চলে গেল। পহান ও মার্কির কোনো ক্ষমতা রইল না। জমিদাররা তাদের কাছ থেকে খাজনা হিসাবে ফসল তো নিলই। আবার জোর করে বিনা মজুরিতে বা বেঠবেগারিতে খাটিয়ে নিতে থাকল।... অত্যাচারী লোকরাই মুণ্ডা-সাঁওতাল হো-ওরাঁওদের কাছে ‘দিকু’ নামে পরিচিত।... তাই শোষণ ও অবিচার বেড়ে চলল। সাহেবদের চোখে আদিবাসীরা ‘চোয়াড়’ ও ‘ডাকাত’। ব্রিটিশ বিচার-ব্যবস্থায় আদিবাসীরা আরো মার খেল। আদালতে কাজের ভাষা হিন্দি ও উর্দু তারা জানে না, বোঝে না। তাদের ঠকাতে থাকল উকিলেরা।”[৬]

চোখের সামনে নিজ জাতির এমন বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে সিধু আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। সে তাদের দেবতা মরংবোঙ্গার কাছে নিবেদন জানায় –

> “মরংবোঙ্গা হে! তুমি মেরে দাও-ওই শালা দিকুদিগে মেরে দাও। লইলে তুমার টাঙ্গি দাও। আমি সব কেটে দিব। মরংবোঙ্গা হে!”[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 345 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এরই মাঝে রাস্তাবন্দির সাদা চামড়ার সাহেবরা মদ আর নারী নিয়ে ফুর্তি করার জন্য তিনজন সাঁওতাল রমণী অর্থাৎ রুকনী-টুকনী-মানকীকে জোর করে বেঁধে নিয়ে চলে যায়। আর এই ঘটনাই সাঁওতালদের মধ্যে এতদিনের জমায়িত ক্ষোভকে উগড়ে দেয়। তারা জমি-বাড়ি সর্বোপরি জাত হারিয়ে শোষকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভয়-ভীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে এবং নিজেদের জীবন বাজি রেখে সিধু-কানু-বিশু ঝাঁপিয়ে পড়ে অসম যুদ্ধে। অপহৃতা সাঁওতাল রমণী রুকনী এক সাহেবকে যে তার ইজ্জত নিয়েছিল সে তাকে খুন করে পালিয়ে আসে। আর এই ঘটনাই সাঁওতালদের সঙ্গে দিকুদের সশস্ত্র আন্দোলনের জন্ম দেয়, -

> "জ্যৈষ্ঠের শেষ অমাবস্যা তিথিতে অন্ধকার রাত্রি মশালের আলোয় ভয়াল করে তুলে সাঁওতালেরা আক্রমণ করেছে সাহেবদের বাংলো। তাদের সর্বাগ্রে মশালধারিণী রুকনী। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছে তারা। সিধু কানু লাল তার পাশে। কী ভয়ংকর দেখাচ্ছে সিধু কানুকে। কপালে তাদের সিঁদুরের লেপন, মাথায় পাগড়ি। পুরাণের বীরদের মতো ধনুর্বাণ নিয়ে শর নিক্ষেপ করছে।"[৮]

সেই রাত্রেই অপহৃতা নারীদের উদ্ধার করে ডিউইর মুণ্ডু নিয়ে তারা ভৈরবী মার কাছে আসে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই ভৈরবী মা-ই এক ঝড়জলের রাতে অসহায়-ক্ষুধার্ত ডিউইর সাহেবকে আশ্রয়-আহার দিয়ে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু ডিউইর সাহেব ভৈরবীর যৌবন দেখে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না। সে তাকে বলপূর্বক ধর্ষণ করে। এই ভৈরবীই পরবর্তীতে সিধু-কানুকে দিকুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যাবতীয় সাহস যোগায়। রাঢ়-বঙ্গের ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের প্রতিবেদনের অনেকটা পরিসর জুড়ে সাঁওতাল নারীজাগরণের চিত্র তুলে ধরেছেন। সাঁওতাল সমাজে নারীর মর্যাদা অনেক উঁচুতে। তারা কখনই নারীকে শুধু ভোগ্যপণ্য বলে মনে করে না। মনে করে নারী পুরুষের যথার্থ সহধর্মিণী। তাই যখনই সাঁওতালরা নারী শোষণের চিত্র দেখতে পায় তখনই তারা বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। আর নারীরাও তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের সঙ্গে হওয়া অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভৈরবী, রুকনী, টুকনী তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তারা বিদ্রোহিণী নারী।

অন্যদিকে চোখের সামনে দিকুরা নিজেদের শোষণের রাজ্যের ভিত নড়তে দেখে সাঁওতালদের জব্দ করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। দেশীয় জোতদার-জমিদার ইংরেজদের সঙ্গে জটলা করে সিদ্ধান্ত নেয়, -

> "...অঙ্কুরেই এর বিনাশ কর। গিভ এ শো টু দেম। কর্নেল, তোমার পল্টন নিয়ে একবার মার্চ করিয়ে দাও। বলে দাও, এই সব বন্দুক যা কাঁধে রয়েছে সিপাইদের, এ সবই তাদের দিকে ঘুরে মৃত্যুবর্ষণ করবে। অ্যান্ড ইউ সি, আমরা ওই কালপ্রিটদের চাই, যারা রেলরাস্তায় তিনটি মেয়ের জন্যে চারজন ইংরেজের রক্তে এদেশের মাটি ভিজিয়েছে, উই ওয়ান্ট দেম। আমি শুনেছি দেয়ার ইজ ওয়ান গার্ল। এ টল গার্ল, দি টর্চ বেয়ারার। সেই-সেই-শী ইজ দ্য ফার্স্ট মার্ডারার। টুমরো গিভ দেম ফার্স্ট শো।"[৯]

সাঁওতালরাও ছেড়ে কথা বলেনি। প্রায় পঞ্চাশ বছরের শোষণে-নিপীড়নে জর্জরিত এই সহজ-সরল অরণ্যচারী মানুষগুলির হৃদয়ে আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয় হয়। মহেশ দারোগা সাঁওতাল অভ্যুদয়ে মা চণ্ডীর কাছে প্রথম বলি। বিদ্রোহী সাঁওতালদের দল প্রথমে কেনারামদের নাগপাশ থেকে গর্বু এবং হাড়মাকে মুক্ত করে। তারপর বাঁধে কেনারাম আর দারোগাকে। গর্বুই সর্বাগ্রে এক সাঁওতালের হাত থেকে যুদ্ধের অস্ত্র টাঙি কেড়ে নিয়ে সজোরে আঘাত করে কেনারামকে। দারোগাকেও আঘাত করে একজন। অতঃপর আহত দারোগাকে বেঁধে এনে রাখশীতলায় বলি দেয় পশুর মতো। তারই রক্তের টিকা পরে সিধু-কানুর দল। এইভাবেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহের বারুদ। বিদ্রোহী সাঁওতালদের দল মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে মুক্ত করে দেবে দশ টাকায় আজীবন কেনা সাঁওতালদের। সেইভাবেই তারা তাদের কর্মসূচি ঠিক করে ফেলে। উত্তরে ভাগলপুর রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তরতীর পর্যন্ত, পূর্বে জঙ্গিপুর-কাঁদী থেকে রামপুরহাট-নারাণপুর হয়ে গনপুর-তিলকুড়ি-বিষ্ণুপুর-আব্দারপুর-কাপিষ্ঠা-বাজনগর-আমজোড়া ঘাট থেকে পশ্চিমে দেওঘরের ধার পর্যন্ত তাদের বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 345 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অতঃপর নীলকুঠি লুঠ করে প্রতিহিংসায়। লারকিন্স সাহেব ও তার ছেলেকে মারে। লারকিন্সের স্ত্রী এবং শ্যালিকাকেও বলি দেয়। তাদের এই রুদ্রমূর্তি দেখে দেশীয় জমিদার-জোতদার শ্রেণি দেশ-গাঁ ছেড়ে পালাতে থাকে। অনেকে আবার আত্মসমর্পণও করে। তবুও তাদের বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে, -

> "কুমড়াবাদের জমিদার প্রাণের ভয়ে জলে নেমে পানা এবং ঘাসের মধ্যে মাথা লুকিয়ে গলা ডুবিয়ে বসেছিল-তাকে চারদিক থেকে তীর মেরে বিঁধে মেরেছিল তারা। নারাণপুরের জমিদারকে নৃশংস আক্রোশে কেটেছিল। প্রথমে হাঁটু পর্যন্ত পা দুটো কেটে বলেছিল-এ লে, চার আনা। তারপর কোমরে কেটে বলেছিল-লে, এবার আট আনা লে। তারপর হাত দুটো কেটে শোধ করেছিল বারো আনা। সবশেষে মুণ্ডু কেটে চিৎকার করে বলেছিল-মারফত। জামতাড়ার রাজা পালিয়েছিল। পাঁড়বার রাজা লুকিয়েছিল।"[১০]

বিশ-ত্রিশ হাজার সাঁওতালদের নিয়ে গঠিত সিধু-কানুর দল এইভাবেই সাহেবগঞ্জ থেকে বীরভূমের ময়ূরাক্ষীর ধার পর্যন্ত একরকম দখল করে নেয়। বাউড়ি-বাগদি-ডোম-ধোপা এদের ওরা কিছু বলেনি। আর বলেনি কামারদের। তাদের তীরের ফলা যোগাতে হত বলেই।

কিন্তু সংগ্রামপুরে এসে তারা ইংরেজেদের-দেশীয় দিকুদের শক্তির কাছে পরাস্ত হয়। তাদের তৈরি দেশীয় অস্ত্র হার মানে দিকুদের বন্দুকের শক্তির কাছে। অবশ্য তাদের এই পরাজয়ের পেছনে অন্ধবিশ্বাসও যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করেছে, -

> "ওদের বিশ্বাস ছিল দেবতার বর ওরা পেয়েছে, ওরা জিতবে। কানু সিধু বিজয়ার দিন বলেছিল-গুলি ইবার আর আমাদের গায়ে বিধবে না। দেবতার হুকুমে গুলি জল হয়ে যাবেক।"[১১]

এই অন্ধবিশ্বাসই তাদের জীবন-জাতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তারা মাদল বাজিয়ে বন-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ে আর কোম্পানির সিপাহিরা পিছিয়ে পিছিয়ে যায়। এরপর ফাঁকা মাঠে তারা গুলি চালাতে শুরু করে। এতে হাজার হাজার সাঁওতালদের রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম মুখ সিধু-কানু পরাস্ত হয় বিদেশি কামান ও বুদ্ধির চাতুর্যের কাছে। কানুর গুলি লাগে কপালে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কানুর মৃত্যু হয়। সিধুর গুলি লাগে হাতে, কাঁধের নীচে। অর্ধমৃত সিধু কোনোক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে এসে এক জায়গায় আশ্রয় নেয় আর বিদ্রোহিণী রুকনী বনে-জঙ্গলেই রয়ে যায়। ফলে তাদের বিচ্ছেদ হয়। এরপর রুকনীকে পাওয়ার জন্য দুর্বল শরীর নিয়ে সিধু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর ইংরেজরাও টের পেয়েছিল যে, সিধু বনজঙ্গলেই লুকিয়ে আছে। সেইমতো তারা ফাঁদ পাতে। তাদের গোয়েন্দা ছিল এক সাঁওতাল নারী। তিনিই রুকনীর কণ্ঠস্বর অবিকল নকল করে সিধুকে ডাকতে থাকে। সেই ডাকের সাড়া দিতে গিয়ে সিধু কোম্পানির সিপাহির কাছে ধরা পড়ে। অতঃপর ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলেই আমরা দেখতে পাই সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য, -

> "...কানু মরেছিল। সিধু মরেনি, ... তারপর ফাঁসি হল সিধুর। সিধুকে ফাঁসি দিলে কোম্পানি বাগনাডিহিতে ওদের গ্রামে সকল লোকের সামনে। তখন সব লোককে মোটামুটি কোম্পানি ক্ষমা করেছে। ফুল তখন গ্রামে ফিরেছে। তাদের সামনেই ফাঁসি হল তার গাছের ডালে ঝুলিয়ে। সিধু এতটুকু ভয় করেনি। বলেছিল-হেরেছি। ফাঁসি দিছিস দে। নিলম ফাঁসি। ফুল, কাঁদিস নাই। রুকনীকে পেলে বুলিস। না, কিছু না। কিছু বলতে হবে না। দে ফাঁসি দে। 'জয় বোঙ্গা' বলে, সে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছিল।"[১২]

পিসিমা, মাতামহীদের কাছ থেকে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং ইংরেজদের কঠোর হস্তে নিষ্ঠুর-বর্বর অত্যাচারে বিদ্রোহ দমনের ইতিহাসে প্রভাবিত হয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৬) উপন্যাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যে সাঁওতাল বিদ্রোহের অনুষঙ্গের অবতারণা করেছিলেন 'কালিন্দী'-তে, তাকেই প্রায় আড়াই দশক পরে লেখা 'অরণ্য-বহ্নি' (১৯৬৬)-তে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। লেখক এখানে ইতিহাসের তথ্য-সত্য, লোকাশ্রয়ী ইতিহাসভাবনা নিঙড়ে বিনির্মাণ করেছেন সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অতীত গৌরবের ইতিহাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা পরবর্তী ছয়ের দশকের সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক দাপাদাপি, হানাহানি কিংবা সর্বস্তরে জমে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 345 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ওঠা বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হিসাবে ইতিহাসের কণ্ঠস্বরকে বেছে নিয়েছেন। আর সে কারণেই সমালোচক বলেছেন,

> "তারাশঙ্কর... বাংলাদেশ ও বাঙালি সমাজের ইতিহাস লেখক। এই ইতিহাসের পূর্বসীমা পলাশীর যুদ্ধের বছর তিরিশ পূর্বেকার সময়, উত্তরসীমা সাম্প্রতিক মুহূর্ত।"[১৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন, অতীতের তথ্যপঞ্জি-ঘটনাবর্ত ইতিহাস নয়। বরং সাহিত্যের মধ্যে জেগে ওঠা জীবনসত্যকে জীবন্ত ইতিহাস বলে মনে করতেন তিনি, -

> "কোন বিশেষ কালের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জির বিবরণ বা ...ব্যক্তির রোজনামচা বা তৎকালীন সংবাদপত্র ইতিহাস দেহের মূল কাঠামো বা তার অস্থিমজ্জাকে ইতিহাসকারের সামনে তার স্পষ্টরূপে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে; কিন্তু সেই অস্থিমজ্জাকে প্রাণবান বিগ্রহ মূর্তিতে মেদ-মাংস-মজ্জা ও প্রাণযুক্ত করে স্থাপন করতে হয়, তাহলে সেকালের সাহিত্যের কাছে যেতেই হবে। ...এখানেই ঐতিহাসিকরা বোধ হয় পরম আনন্দে সাহিত্যের কাছে ঋণ স্বীকার করেন।"[১৪]

তাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য-বহ্নি' আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অসহায়-যন্ত্রণাক্লিষ্ট বেদনার ব্যতিক্রমী আখ্যান। তারাশঙ্কর খুঁজে পান একটি আদিম জনজাতির অভ্যুত্থান।

> "সিধু আজও মুক্তি পায়নি, ইতিহাস ওকে মুক্তি দেয়নি। আজও সে বুকে হাত দিয়ে ছায়ায় মিশে সেই ফাঁসি-যাওয়া গাছের মহুয়া গাছটায় ঠেস দিয়ে ভাবে।"[১৫]

এইভাবেই উপন্যাসের কথনবিশ্বে আদিবাসী সাঁওতাল জনজাতিকে বিশেষ মর্যাদায় স্থান দিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের বিশ্বাস, ইতিহাস, জাতি-পরিচয়, বাসভূমি, জীবনযাত্রা, সংস্কার, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জীবিকার সংকট, ভিন্ন শ্রেণির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সবকিছুই অনাবৃত করেছেন 'অরণ্য-বহ্নি'-তে।

Reference:

১. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পা.), *তারাশঙ্কর দেশ কাল সাহিত্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃ. ১১
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *অরণ্য-বহ্নি, রচনাবলী (অষ্টাদশ খণ্ড),* মিত্র ও ঘোষ, ভাদ্র ১৩৮৭, পৃ. ৩১৬
৩. তদেব, পৃ. ৩৫২
৪. তদেব, পৃ. ৩১৬
৫. তদেব, পৃ. ২৯১
৬. দেবী, মহাশ্বেতা, *বিরসা মুণ্ডা,* প্যাপিরাস, ২০০২, পৃ. ১১
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *অরণ্য-বহ্নি, রচনাবলী (অষ্টাদশ খণ্ড),* মিত্র ও ঘোষ, ভাদ্র ১৩৮৭, পৃ. ৩০০
৮. তদেব, পৃ. ৩৩৭
৯. তদেব, পৃ. ৩৩৯
১০. তদেব, পৃ. ৩৬০
১১. তদেব, পৃ. ৩৬৬
১২. তদেব, পৃ. ৩৬৯
১৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের প্রতিমা,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯, পৃ. ২৮
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *ইতিহাস ও সাহিত্য, তারাশঙ্কর রচনাবলী (একবিংশ খণ্ড),* মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫৮
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *অরণ্যবহ্নি, তারাশঙ্কর রচনাবলী (অষ্টাদশ খণ্ড),* মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯০